



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 200 - 208

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘যাও পাখি’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন

ড. শেখ নজরুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আকুই কমলাবালা উইমেন্স কলেজ, বাঁকুড়া

Email ID : sknazrulislam80@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Jaao Pakhi, Marital discord, Reconciliation, Couples, Bengali literature, Post-Partition society, Marital harmony, Poignant sociological document.

Abstract

Shirshendu Mukhopadhyay's novel Jaao Pakhi (1976) intricately explores the complexities of marital relationships, portraying the emotional turbulence, unspoken conflicts, and eventual reconciliations that define human bonds. The novel, initially serialized in Desh magazine and later expanded into a book, delves into the lives of three couples— Brajgopal-Nonibala, Raneen-Beena, and Ajit-Shila—each representing distinct facets of conjugal strife and resilience.

At the heart of the narrative is Brajgopal and Nonibala's marriage, which deteriorates from affectionate banter to bitter resentment due to Brajgopal's neglect and Nonibala's growing isolation. Their story reflects how unaddressed grievances and societal pressures can erode love, yet hints at the possibility of late-life redemption. In contrast, Raneen and Beena's relationship is marked by mutual distrust and toxic masculinity, culminating in violence—a stark commentary on patriarchal dominance and emotional detachment in urban middle-class marriages. The third couple, Ajit and Shila, embodies a seemingly harmonious union disrupted by unspoken insecurities, particularly Shila's ambiguous friendship with a colleague, which strains their trust.

Through these relationships, Mukhopadhyay underscores that marital harmony requires more than love—it demands empathy, communication, and compromise. The novel's cyclical structure, ending with tentative reconciliations, suggests hope amid despair. Jaao Pakhi thus serves as a poignant sociological document, revealing how external chaos (e.g., post-Partition displacement) and internal conflicts shape intimate bonds. Ultimately, the novel affirms that while marital tensions are inevitable, understanding and forgiveness can rekindle connection, making it a timeless exploration of human vulnerability and resilience.



Discussion

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ উপন্যাস ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। গ্রন্থাকারে যখন প্রকাশ পায় তখন উপন্যাসটি বহুল অংশে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করা হয়, একথা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন –

“দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময়ে উপন্যাসটি বহুল অংশে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।”^১

যাই হোক, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ মনে গেঁথে যাওয়া একটি উপন্যাস। এর বর্ণাঢ্য বিস্তারে, ঘাত-প্রতিঘাতে, বিরহ-মিলনের অসংখ্য ছবির মধ্যে জগৎ ও জীবন উৎকীর্ণ হয়ে আছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে –

“খুনে ডাকাত বহেরু একখানা গাঁ তৈরি করেছিল। নিজেই তার নাম রেখেছিল বহেরু গাঁ। সেখানে মানুষের চিড়িয়াখানা তৈরি করেছে সে। যত কিস্তুত মানুষ ধরে এনে আশ্রয় দিত সেই বহেরু গাঁয়ে। সংসারে বনিবনার অভাবে একদা এই গাঁয়ে চলে এলেন ব্রজগোপাল। এ-সংসারে কিছু চাওয়ার নেই তাঁর। ডায়েরির সাদা পাতায় তবু তিনি লিখে রেখেছিলেন – ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধ ও দিশাহীনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্রজগোপাল কি এক অসংশয়িত উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন? সংসার-উদাসী বাবার খোঁজে বহেরুতে এসেছিল সোমেন। বাবার রোজানামচায় লেখা ওই পঙক্তি-রহস্য বুক নিয়ে সে কলকাতায় ফিরে গেল। বহেরু গাঁ থেকে ফিরে তাকে যেতে হলই, কেননা প্রত্যেক মানুষেরই একটা ফেরার জায়গা চাই। যদিও সেই কলকাতায়, যেখানে অন্যরকম জীবন, হাজার রকম মানুষ। সোমেনকে ঘিরে এক সৃষ্টিছাড়া সমাজ। তারপর? রিখিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছে? গ্রাম ও কলকাতা – এই দুই বৃত্তের টানাপোড়েন এবং সংলগ্নতায় সৃষ্ট এই কাহিনী নিষ্ঠুর সময়ের অভিঘাতে পীড়িত ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ অ্যালবাম।”^২

অবশ্যই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের টানাপোড়েন মূল বিষয়। এবং সমাপ্তিতে পূর্ব-আভাস মতোই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝেই চরিত্রগুলি প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে। এর মধ্যে কোনও চমক নেই। কিন্তু আমার কাছে উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্য অন্য কারণে। যেটা হয়তো স্বয়ং উপন্যাসিকও সেভাবে ফুটিয়ে তুলবেন মনস্তির করেননি। কিন্তু হয়ে গেছে। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। লেখকের স্বজ্ঞান অভিপ্রায় থাকে এক, আর লেখায় ফুটে ওঠে অন্য কোনও এক দিক! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ উপন্যাসে সেরকমই ঘটেছে বলে অন্তত আমার মনে হয়েছে। আর সেটি হল দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন।

‘যাও পাখি’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন অসাধারণ মনন চেতনায় ফুটে উঠেছে। দাম্পত্য সম্পর্ক - একটি সামাজিক চুক্তি মাত্র নয়, এটি এক গভীর আবেগের বন্ধন, যেখানে দুটি পৃথক মানুষ একে অপরের সঙ্গে জীবন ভাগ করে নেওয়ার অঙ্গীকার করে। এই সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে বিশ্বাস, সম্মান, ভালোবাসা ও সমঝোতার উপর। কিন্তু বাস্তব জীবনের গতিপথ সব সময় সমান নয়। কখনও কখনও ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান, কিংবা অব্যক্ত চাহিদাগুলো এক অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি করে দু’জন মানুষের মধ্যে। এই উপন্যাস সেইসব টানাপোড়েনের গল্প বলে, যেখানে একসময় খুব কাছের মানুষও অচেনা হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় - ভালোবাসা কি শেষ হয়ে যায়? নাকি একে নতুন করে চিনে নিতে হয়? সম্পর্ক কি শুধুই বাধ্যবাধকতা, নাকি তা একটি নিরন্তর যাত্রা, যেখানে পথ হারিয়ে আবার খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থাকে? আসলে ‘যাও পাখি’ উপন্যাসের কাহিনী শুধুই একটি দাম্পত্য জীবনের নয় - এটি আত্মানুসন্ধান, ক্ষমা, পুনর্মিলন এবং নিজেকে ও অপরকে নতুন করে বুঝে ওঠার আখ্যান।

এই উপন্যাসে ব্রজগোপাল আর ননীবালার দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন সর্বাধিক। বলা চলে পাঠকের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক আকর্ষণীয়। ব্রজগোপাল আর ননীবালার দাম্পত্য সম্পর্ক প্রেমের আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা থেকে শুরু করে জীবনের



কঠিন বাস্তবতায় প্রবেশ করা এক জটিল ও নান্দনিক গাথা। এটি শুধু দুটি মানুষের মিলন নয়, বরং দুটি জগতের সংঘাত ও সমন্বয়ের অঞ্চল ইতিহাস। ভালোবাসা, বিশ্বাস, আবেগ, প্রত্যাশা ও সমঝোতার সূক্ষ্ম সূত্রে বোনা এই বন্ধন কখনও স্বর্গের মতো মধুর, আবার কখনও রুক্ষ পৃথিবীর মতোই বেদনাদায়ক।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজগোপাল আর ননীবালার দাম্পত্য জীবনে জমে ওঠে নীরব অভিমান, অব্যক্ত ক্ষোভ, অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা - যেগুলো একসময় অদৃশ্য দেয়াল তুলে দেয় দুই হৃদয়ের মাঝে। প্রাথমিক ভাবে ব্রজগোপালকেই যেন এর জন্য একক দায়ি মনে হয় -

“কিছু লোক থাকে যারা ঘর-জ্বালানি কিন্তু পর-ভুলানি। নিস্পন্ন লোকেরা নাম শুনলে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বলে সাক্ষাৎ দেবতা। অমন পরোপকারী মানুষ হয় না। কিন্তু ঘরের লোক জানে, ওরকম খেয়ালি, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর মানুষ আর নেই। ...ভরা যৌবনে স্ত্রীকে রাতে-বিরেতে পাড়াপড়শির ভরসায় ফেলে রেখে বাবা যাত্রা-থিয়েটারে যেত।”^৩

মা ননীবালার কাছে তার বাবা সম্পর্কে একথা শুনেছে সোমেন।

ব্রজগোপাল আর ননীবালার সন্তানরা ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছে, তাদের বাবা বাড়ি ফিরলেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। প্রথম প্রথম সে ঝগড়ার মধ্যে মান-অভিমান ছিল; মানভঙ্গনও চলত। সেসব মানভঙ্গনের পালা দেখে তাদের সন্তানরা তা উপভাগও করত -

“বাবা মার পায়ে মাথা কুটেছে, আর মা খুশিয়ালি মুখে ভয়-পাওয়া-ভাব ফুটিয়ে বলছে, পায়ে হাত দিয়ে আমায় পাপের তলায় ফেলছ, আমি যে কুষ্ঠ হয়ে মরব!”^৪

কিন্তু ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজগোপাল আর ননীবালার ঝগড়ার রকম পালটেছে। পালটেছে দাম্পত্য সম্পর্কের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা।

সবে দেশভাগ হয়েছে। নিপাট ভদ্র, সৎ ব্রজগোপাল কোনওখানে জমি দখল করে রাখতে পারল না। স্ত্রী ননীবালার কাছে তাই তার স্বামী একটা ‘অপদার্থ’ মানুষ! ননীবালাকে নিয়ে ব্রজগোপাল ভাড়াটে বাড়িতে সংসার পেতেছে। দু-তিনরকমের চাকরি করেছে ব্রজগোপাল সেসময়। প্রথমে ভলান্টিয়ার, তারপর রেশনের দোকান, পরে কাপড়ের ব্যবসা। কিন্তু কোনওটাই সুবিধে করতে পারেনি। সবশেষে একটু বয়সকালে একটা সরকারি কেরানিগিরি জুটিয়ে নেয়। কিন্তু ‘বার-ছুট নেশা’ তার ছিল সমান। দিনের পর দিন ব্রজগোপাল বাড়ি ফিরত না। আসলে ব্রজগোপাল ছিল পরোপকারী প্রকৃতির মানুষ। বনগাঁ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ব্রজগোপাল বিভিন্ন জায়গায় যেত উদ্বাস্তুদের তদারক করতে, কিংবা কোনও মচ্ছবের ব্যবস্থায়, সংকীর্ণনের দলে। এদিকে বাড়িতে ননীবালা তার চারটি শিশু-সন্তান নিয়ে একা। সহ্য করে করে ক্রমশ ননীবালার অন্তরের নিঃসঙ্গতা দাম্পত্যের মৌলিক ভিত্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

এখন ব্রজগোপাল আর ননীবালার ঝগড়ায় সেই আগের মান-অভিমান মরে যেতে লাগল। এল গালাগালি। ননীবালা এখন অবলীলায় স্বামীকে বলে ‘শয়তান, বেইমান’, আর ব্রজগোপাল নির্দিধায় স্ত্রীকে বলে ‘নিমকহারাম, ছোটলোক।’ একটা সময় এমন হল যে ব্রজগোপাল বাড়িতে না ফিরলেই যেন ননীবালা ভালো থাকে। পরস্পরের প্রতি আক্রোশ তাদের ক্রমে যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এসময় ননীবালাও বেশ মুখরা হয়ে যেতে থাকে। ফলে অশান্তি এড়াতে ব্রজগোপাল আরও বেশি ‘বার-মুখে’ হয়ে যেতে লাগল। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের এই পরিণতি সন্তানদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে থাকল। তারা আশ্রয় চেষ্টা করতে লাগল বাবা-মায়ের মধ্যকার সম্পর্কটাকে জোড়া লাগাতে -

“বড় হয়ে তারা ভাই-বোনেরা বাবা-মায়ের স্থায়ী ঝগড়াটা মিটিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা কিংবা মা আলাদাভাবে কেউই লোক খারাপ ছিল না। মা-বাবাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বুড়ো বয়সে লেট হানিমুন করতে পাঠালে পুরীতে। বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের বিশাল বিস্তারের সামনে, আর তীরের গুণে যদি দুজনের মধ্যে একটা টান জন্মায়। কিন্তু মা বাবা খড়গপুর পার হতে পারেনি। সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে দুই আলাদা কামরায় চড়ে দুজনে ফিরে এল। বাসায় ফিরল আলাদা ট্যাক্সিতে। কথা বন্ধ।”^৫



ব্রজগোপালের রিটায়ারের পর তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটা আরও ভয়ানক জায়গায় এসে দাঁড়াল। এবার তাদের ঝগড়াটা এমন চরম অবস্থায় এল যে ননীবালা তার স্বামীকে অকপটে বলে, ‘তুমি মরো’; আর ব্রজগোপাল ভবিষ্যৎ বাণী করে বলে, ‘আমি মরলে বুঝবে, দুনিয়াটা হাতের মোয়া নয়।’^৬ এদিকে তাদের বড়ো পুত্রের বউ এসেছে ঘরে, তাদের সন্তান হয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। এমন অবস্থায় ছেলে-মেয়ে-জামাই-বউমা নিয়ে ননীবালার পক্ষের পাণ্ডাই বেশ ভারী। নিজের বাড়িতেই ব্রজগোপাল ক্রমশ একা হয়ে যেতে থাকে। শেষে ব্রজগোপাল অভিমানে বাড়ি ছাড়ল! ব্রজগোপালের বাড়ি ছাড়াটা তখন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এরপর থেকেই ব্রজগোপাল আর ননীবালার দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন অন্য খাতে বইতে শুরু করে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সম্পর্কের গভীরতা, মানবিক সংগ্রামের মর্মান্তিক ও মাধুর্যপূর্ণ দিক। এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব।

ব্রজগোপাল শহর থেকে দূরে এক গাঁয়ে এসে থাকতে লাগল। আপন পরিবার ছেড়ে! সকলের মোহ ত্যাগ করে। কালেভদ্রে শহরে যায়, পরের মতো করে। ছোট ছেলে সোমেন স্মৃতিচারণা করে –

“গত পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে সে বাবাকে দেখেছে এক-আধবার। বড়ো মতো, টান-টান চেহারার একজন গ্রাম্য লোক, ঢোলহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা, সদর থেকে বউদি বা দাদার ছেলেমেয়ে, কিংবা বি-চাকরের কাছে বাড়ির লোকের কুশল জিজ্ঞাসা করে চলে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকত না, বাড়ির জলটলও খেত না।”^৭

কিন্তু ফিরে আসবার সময় সিঁড়ি ভাঙত আস্তে আস্তে। দু’একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাত। জোরে গলা খাঁকারি দিত। আসলে ব্রজগোপালের হৃদয়ে তখনও স্ত্রী ননীবালার উপস্থিতি! কিন্তু অভিমান দু’জনকেই পরস্পরের নিকটে আসতে বাধা দিতে থাকে।

এই উপন্যাসের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ হল মানব-সম্পর্কের জটিলতা, যা কখনও কখনও আমাদের অজান্তেই গভীর মানসিক টানাপোড়েনের জন্ম দেয়। ব্রজগোপাল ও ননীবালার সম্পর্ক তেমনই এক নির্মল অথচ বিষন্ন অধ্যায়, যেখানে একদা প্রগাঢ় ভালোবাসায় বাঁধা দুই হৃদয়, সাংসারিক অশান্তির কারণে পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু পরিণতিতে আমরা উপলব্ধি করি, এই দূরত্ব ছিল শুধু দেহগত, মনের গভীরে তারা একে অপরের জন্যই অপেক্ষা করে।

দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল, অভিমান, কিংবা অপরিপক্ব ইগো একসময় ভালোবাসাকে ছাপিয়ে ওঠে। ব্রজগোপালের পুরুষতান্ত্রিক অহংকার ও ননীবালার নীরব যন্ত্রণা এক দুঃসহ ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সময় যত এগোয়, বয়স যত বাড়ে, মানুষ তখন অতীতকে ফিরে দেখতে শেখে— অনুতাপ ও অপূর্ণতার দন্ধ ছায়া হৃদয়ে চেপে বসে। বৃদ্ধা ননীবালা এবার আবারও কাছে আসতে চায় ব্রজগোপালের, চায় পুরোনো ভালোবাসার স্বাদ ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু মানসিক দ্বিধা, আর অভিমানের অবশিষ্ট শেকল তাকে থমকে দেয়।

এই পরিস্থিতি যেন একটি নিঃশব্দ যুদ্ধ— যেখানে শব্দ নেই, শুধু দীর্ঘশ্বাস, চুপ করে তাকিয়ে থাকা, এবং ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়া হৃদয়। কথার অভাবে সম্পর্ক যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি অনুচারিত ইচ্ছা অনেক সময় অনন্ত অপেক্ষার জন্ম দেয়। এই উপন্যাস শুধু এক দম্পতির গল্প নয়, এটি আমাদের সমাজের অনেক স্তর সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। যেখানে মানুষ ভালোবাসে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। যেখানে মনের ভাষা থাকলেও মুখের ভাষা হারিয়ে যায়।

এই মনস্তত্ত্বের গভীরে রয়েছে এক অনন্ত আকুলতা— ‘তুমি ফিরে এসো’, কিংবা ‘আমাকে একবার ডাকো’ — এই চাওয়ার মাঝেই উপন্যাসটি হয়ে ওঠে হৃদয়বিদারক ও মানবিক। ব্রজগোপাল ও ননীবালার দাম্পত্য সম্পর্কের এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আমাদের মনে প্রশ্ন তোলে— ভালোবাসা কি শুধু উপস্থিতি নয়, অনুপস্থিতির মধ্যেও কি তার আর্তি নেই? এই প্রশ্নের উত্তরে, হয়তো আমরা নিজেরাও নিজেদের জীবনের সম্পর্কগুলিকে নতুন করে ভাবতে শেখি।

বৃদ্ধ বয়সের সন্ধ্যায় এসে প্রেমের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা কী? সম্ভবত—অভিমান ভাঙার মুহূর্তটি। ব্রজগোপাল আর ননীবালার জীবনের গল্পটি যেন বাংলার মাটির গভীরে প্রোথিত এক করুণ রাগিণী, যেখানে ভালোবাসা আর অহংকারের দ্বন্দ্ব বারবার মুখোমুখি হয়। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি, বিচ্ছেদের কষ্ট, আর শেষবেলায় ফিরে আসার আকুলতা— এই ত্রয়ী



নিয়ে রচিত হয়েছে এই মর্মস্পর্শী উপন্যাস, যেখানে মানবহৃদয়ের গহীন দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে নিখুঁত ভাষায় ও গভীর অনুভূতিতে

“ননীবালা কেন স্যুটকেস গোছাচ্ছেন তা অনুমান করতে ভয় পাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। নিপাট ভালমানুষের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আন্তে করে বললেন – শোনো, এখন বয়স হয়েছে। তোমারও আমারও।

ননীবালা মুখ তুলে বলেন – সে তো জানি। বলছ কেন?

- এখন ছুট করে কিছু করতে নেই, দৃষ্টিকটু দেখায়।

ননীবালা একটু শ্বাস ছাড়লেন। স্যুটকেস যেমন গোছাচ্ছিলেন তেমনই গোছাতে লাগলেন। বললেন – ছুট করে নয়। অনেকদিন ধরেই এটা ভেবে আসছি। আজকাল আর মন টেকে না এখানে।”^৮

ননীবালার এই স্বীকারোক্তি উপন্যাসের চরম মুহূর্ত।

ব্রজগোপাল ও ননীবালার সম্পর্কে জমে থাকা অভিমান কখনও উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু তা রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। সংসারের দৈনন্দিন সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় দুটি একসময় আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু বিচ্ছেদের নির্জনতা তাদের কাছে এনে দেয় এক গভীর উপলব্ধি— সময়ের স্রোতে সব ঝালাইয়ের চেয়ে সম্পর্কই বড়ো। ব্রজগোপালের একাকী বসবাস কিংবা ননীবালার নিশ্বাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা আকুলতা— উভয়েরই মনোজগতে চলেছে এক নীরব সংলাপ। এই উপন্যাসের শক্তি হল - পরিণতিতে এই নীরবতাকে শব্দদান করা, যেখানে পাঠক নিজেদের খুঁজে পান।

ব্রজগোপাল ও ননীবালার দাম্পত্যের টানাপোড়েন এবং পরিশেষে আবার তাদের মিলন - আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দাম্পত্য-প্রেম কখনও মরে না, শুধু মাঝেমাঝে ঘুমিয়ে পড়ে। এই উপন্যাস এক অনবদ্য মানবিক দলিল, যেখানে পাঠক ব্রজগোপাল-ননীবালার মধ্যে নিজের জীবনের টুকরো খুঁজে পাবেন। শেষ পর্যন্ত, ভালোবাসাই হয়তো একমাত্র ভাষা, যেখানে সব অভিমান ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

‘যাও পাখি’ উপন্যাসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আরও একটি দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। রণেন ও বীণার দাম্পত্য সম্পর্ক। ব্রজগোপাল-ননীবালার প্রথম পুত্র রণেন। একটি কোম্পানিতে চাকরি করে রণেন। বীণা গৃহবধূ। রণেন-বীণার মধ্যকার সম্পর্কটা পাঠককে বেশ ভাবিয়ে তোলে। দু’জনের সম্পর্কের মধ্যে পরস্পরের প্রতি তেমন বিশ্বাস যে নেই, তা শুরু থেকেই পাঠক বেশ উপলব্ধি করবেন। অথচ একই ছাদের নিচে তারা জীবন কাটায়!

“ভারী হালকা আর ফুরফুরে আছে মনটা। সকাল থেকেই যে গান্ধীর্ষ তাকে চেপে ধরে সেটা কদিন হল একদম নেই। বীণা নার্সিং হোমে যাবার পর থেকেই নেই।”^৯

এমন অনুভূতি রণেনের। এমনকি বীণার পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার খবরেও সে বিশেষ দুঃখিত বা বীণার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়।

“বীণা আপাতত নার্সিং হোমে। পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। তা যাক। রণেন সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না।”^{১০}

স্ত্রী বীণাকে নিয়ে যেমন রণেনের সেরকম ভাবনা নেই, ঠিক তেমনি বীণারও স্বামীকে নিয়ে আদিখ্যেতা দেখা যায় না।

“বীণা ঝোঁঝে ওঠে – ভিজিটিং আওয়ার্স না হাতি! সারাদিন রাজ্যের লোক আসছে যাচ্ছে! পরশু এক ছুঁড়ি ভরতি হয়েছে, তার কাছে সারাদিনই দু-তিনটি ছোঁড়া আসছে, ফুল, ক্যাডবেরি, সিনেমার কাগজ দিয়ে যাচ্ছে, গুজগুজ ফুসফুস করছে – তারা আসছে কী করে? আর তোমার অফিসটাই বা কোন জেলখানা? সারাদিন টো-টো করে বেড়ানোই তোমার চাকরি! ... এরকম ভাষাতেই বীণা আজকাল কথা বলে।”^{১১}

‘যাও পাখি’ উপন্যাস যে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, তা রণেন-বীণার সম্পর্ক থেকে স্পষ্টতর হয়। এদের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন দাম্পত্য জীবনের গভীর



টানাপোড়েন, পারস্পরিক অবিশ্বাস, এবং মানসিক দূরত্বের চিত্র। রণেন ও বীণা - যারা একই ছাদের নিচে বসবাস করলেও একে অপরের থেকে যেন আলাদা দু'টি গ্রহে বসবাস করে। রণেন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী; দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি, অফিসের চাপ ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, বীণা একজন গৃহবধূ, যার জীবন বন্দী হয়ে আছে রান্নাঘর আর সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে। দু'জনেই একে অপরের চাহিদা বুঝতে ব্যর্থ, ফলে তাদের সম্পর্ক ক্রমশ এক নিঃশব্দ দূরত্বে গড়ে ওঠে। রণেনের জমি ক্রয় করা এবং তা কার নামে রেজিস্ট্রি হবে - তাই নিয়ে দু'জনার মধ্যে তুমুল অশান্তি এবং বীণার গায়ে হাত তুলে রণেনের পুরুষত্ব ফলানোর মধ্যে দু'জনের সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে এগিয়ে যায়।

“বীণা তার দিকে আঙুল তুলে বলে - তুমি পাগল নও? আগে এসব জানলে তোমার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিত? পাগলের বংশে কেউ জেনেশুনে মেয়ে দেয়?

রণেন মশারি সরিয়ে বিছানার ধারে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা পড়ে গেল। শূন্য এবং ভয়াবহ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে রণেন। এখন থেকে এই মেয়েমানুষটার চেয়ে বড় শত্রু তার আর কেউ নেই। ওই ভঙ্গি থেকেই সে হঠাৎ পা বাড়িয়ে লাথিটা কষাল বীণার বুকে। টুবাই ছিটকে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে। বীণা পড়ে গিয়ে ফের উঠতে যাচ্ছিল। রণেন বুকে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে তাকে হেঁচড়ে তোলে, অক্ষুট গলায় বলে - হারামজাদি, আমাকে জামাই পেয়ে তোর চোন্দোপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে... বলতে বলতে সে তার ডান হাতে গোটাকয় প্রচণ্ড চড় মারে বীণার গালে। দেয়ালের কাছে নিয়ে মাথা ঠুকে দেয়, মুখ ঘষে দেয় দেয়ালে।”^{১২}

একসময় পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে - এই সম্পর্ক কি শুধুই সামাজিক দায়বদ্ধতা, নাকি এর ভেতরে কোথাও জীবনের গভীর অতৃপ্তির ছাপ লুকিয়ে আছে? রণেন-বীণার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব যেন প্রতিটি পরতে পরতে উদ্ঘাটিত হয়। সামান্য বিষয়ে সন্দেহ, একে অপরের অনুভূতির প্রতি অবজ্ঞা, এবং নিরুত্তাপ সহাবস্থান - এই সব কিছুই মিলে তাদের দাম্পত্য জীবনে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এখানে কেবল রণেন-বীণার ব্যক্তিগত গল্প বলেননি; বরং সমাজের অসংখ্য মধ্যবিত্ত দম্পতির অজানা যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্ক মানে কেবল একত্রে বসবাস নয় - তার মূলে আছে পারস্পরিক বোঝাপড়া, মানসিক সংযোগ ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু যখন এই ভিত্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সম্পর্কের ভিত্তিও ভেঙে পড়ে। উপন্যাসে এই সম্পর্কের নিঃসঙ্গতা ও জটিলতা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে - আমরা কি সত্যিই আমাদের নিকটজনকে বোঝার চেষ্টা করি? নাকি কেবল সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখি?

‘যাও পাখি’ উপন্যাসে রণেন ও বীণার দাম্পত্য সম্পর্ক এক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় - একটি সমাজের, একটি সময়ের, এমনকি একটি মনস্তত্ত্বের। এই সম্পর্কের টানাপোড়েন আমাদের শিখিয়ে দেয় - মানুষ যতই ঘরের ভেতর থাকুক না কেন, হৃদয়ের দরজা বন্ধ থাকলে সে একা হয়ে যায়; দুই মানুষ - একই ছাদের নিচে থেকেও একাকিত্বের গহ্বরে হারিয়ে যায়, কিভাবে দাম্পত্যের নামে চলতে থাকে ক্ষমতার অপব্যবহার! উপন্যাসে রণেন ও বীণার দাম্পত্য সম্পর্ক পাঠকের সামনে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসে - যেখানে ভালোবাসা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রত্যাশা ও মানসিক দূরত্ব একে অপরকে ছাপিয়ে যায়।

‘যাও পাখি’ উপন্যাসের আর একটি দাম্পত্য সম্পর্কের কথা বলে ইতি টানব। অজিত ও শীলার দাম্পত্য-জীবন। ব্রজগোপাল-ননীবালার মেয়ে শীলা। স্কুলের শিক্ষিকা। স্বামী অজিতও চাকুরিজীবী। প্রাণখোলা মানুষ। স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। প্রকৃতপক্ষে অজিত-শীলার দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের - যেখানে প্রেম আছে, অভিমান আছে, আছে কপট অভিযোগ -

“শীলা তবু কাঁদে। সাধাসাধি করে করে ক্লান্ত হয়ে গেল অজিত। ঘুমও হবে না। অগত্যা উঠে একটা ডানহিল ধরায়।



সেই শব্দে শীলা হঠাৎ ফোঁপানি বন্ধ করে বলে – তুমি চলে গেলে কেন? ভিতরে এস।

- যাচ্ছি। সিগারেটটা খেয়ে নিই।

- না। সিগারেট নেবাও।

- আঃ, একটু অপেক্ষা করো না।

- না, এফুনি ভিতরে এস।

অজিত শ্বাস ফেলে বলে – কখন যে কী মনে হয় তোমার! একখানা হাত টেনে নেয় বুকের ওপর।

অজিত আন্দাজে বালিশের তোয়ালে তুলে শীলার চোখ-মুখ মুছে দেয়। বলে – কেন কাঁদলে? বাবার জন্ম, নাকি রণেন জমি বউয়ের নামে কিনছে বলে?

- ওসব কারণ নয়।

- তবে?

শীলা চুপ করে থেকে বলে – আমি একটা জিনিস টের পাই আজকাল।

- কী?

- তুমি আমাকে ভালবাস না।^{১০}

শীলার এই কপট অভিযোগেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের দাম্পত্যের প্রেমের গভীরতা। এমনকি বিয়ের বহুদিন পরও শীলার সন্তান হয়নি বলে অজিত তাকে প্রকৃত জীবনসাথীর মতো সান্ত্বনা দিয়েছে –

“শীলা কেঁদেছে, বলেছে – তোমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিসটাই দিতে পারলাম না।

- দূর দূর! অজিত সান্ত্বনা দিয়েছে – বাচ্চাকাচ্চা হলে ঝামেলাও কম নাকি। হল হয়তো, বাঁচল না।

তখন বাচ্চা না হওয়ার চেয়েও বেশি কষ্ট। ছেলেপুলে বড় করা কি সোজা কথা!”^{১১}

যদিও এটা কোনও সান্ত্বনার কথাই নয়। তবু আশ্চর্য যে, শীলা অজিতের কথায় সান্ত্বনা পায়! এটাই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বোঝাপড়া।

শীলা-অজিতের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম অনুভবের বন্ধন - যা নির্মিত হয়েছে সম্মান, ভালোবাসা ও মানসিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। তবে এই সম্পর্ক মাঝে মাঝে এক অদৃশ্য ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে; তখন তা কখনও কখনও এক অনুচ্চারিত উত্তেজনার রূপ নেয়। ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় এই ধরণের টানাপোড়েন ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে সম্পর্কের গভীরতা যেমন অনুভব করা যায়, তেমনি তার ভঙ্গুরতাও প্রকাশিত হয়। এমনই এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই অজিত ও শীলার দাম্পত্য জীবনে।

নিশ্চিতভাবেই অজিত ও শীলা দু’জনেই একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে আন্তরিকতা, স্নেহ এবং এক নিবিড় বন্ধন। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সংবেদনশীল কলমে তাদের প্রেমের রসায়নকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই সম্পর্কের মধ্যে যে উষ্ণতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে, তা আদর্শ দাম্পত্য জীবনের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু এই নিখুঁত চিত্রের মাঝেই ধীরে ধীরে এক অস্থিরতা প্রবেশ করে - সুভদ্র নামক এক চরিত্রকে কেন্দ্র করে।

সুভদ্র, শীলার স্কুলের সহকর্মী। সুভদ্রের সঙ্গে শীলার সম্পর্ক বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন –

“শীলার সঙ্গে সুভদ্রের পরিচয় কিছু গাঢ়। বলতে নেই, স্কুলে শীলার মতো সুন্দরী কমই আছে। একটু সুখের মেদ জমেছে সম্প্রতি, নইলে শীলার আর কোনও খুঁত নজরে পড়ে না, দিঘল চোখ দুখানায় এখনও অনেক কথার, ইঙ্গিতের রহস্যের খেলা দেখায় শীলা, সিঁথেয় সিঁদুর যাদের আছে তারা ছেলেদের সঙ্গে সহজেই প্রথম আলাপের সংকোচটা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই সুন্দর কিশোরপ্রতিম চেহারার যুবকটির সঙ্গে আড্ডা দিতে বরাবরই ভাল লেগেছে শীলার।”^{১২}

শীলা ও সুভদ্রের সম্পর্ক নিয়ে অন্যান্য সহকর্মীরাও রসিকতা করে।

সুভদ্রের উপস্থিতি যেন এক অদৃশ্য অশান্তির ছায়া হয়ে নেমে আসে অজিত-শীলার দাম্পত্য জীবনে। অজিতের মনে এক দৃঢ় ধারণা জন্ম নেয় - শীলার সঙ্গে সুভদ্রের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এই সম্পর্কের কোনও প্রমাণ

বা স্পষ্ট বক্তব্য নেই, তবু অজিতের মনে এক অজানা ঈর্ষা ও সংশয়ের বীজ বপিত হয়। এদিকে, শীলার আচরণও কম রহস্যময় নয়। যখনই সুভদ্রর প্রসঙ্গ ওঠে, শীলা অস্থির হয়ে ওঠে, মুখে কিছু না বললেও তার চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নীরব অস্বস্তি যেন অজিতের কাছে অনেক বড় সত্যকে ঢেকে রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষভাবে অজিত-শীলার দাম্পত্য জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন জাগলে তা বর্তমানকে কতটা বিচলিত করতে পারে - এই বিষয়টিই এখানে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শীলা হয়ত নিজের এই অপ্রকাশিত সম্পর্ক পেছনে ফেলে অজিতের জীবনে নতুন ভাবে প্রবেশ করতে চেয়েছে, কিন্তু তার আচরণে কিছু না বলা সত্যের ইঙ্গিত থেকে যায়। অন্যদিকে, অজিত তার ভালোবাসা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব প্রতিনয়িত দক্ষ হয়। সে হয়ত শীলাকে বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু মনে একরকম অস্থিরতা কাজ করে, যা সম্পর্কের গভীরে এক অব্যক্ত দূরত্ব তৈরি করে।

শীলা ও অজিতের এই দাম্পত্যের টানাপোড়েন আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, বিশ্বাসহীন ভালোবাসা কখনওই পূর্ণতা পায় না। অতীতকে যদি হৃদয়ের গহীনে গোপন রাখা হয়, তবে বর্তমান তার ছায়ায় ঢেকে যেতে বাধ্য। আর সেই ছায়া যতই নিঃশব্দ হোক না কেন, তা সম্পর্ককে নিঃস্ব করে দিতে পারে। অজিত ও শীলার সম্পর্কের মধ্যকার এই টানাপোড়েন কেবল দুটি ব্যক্তির নয়, বরং সমাজে প্রতিফলিত বহু দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। ভালোবাসা তখনই সত্যিকার অর্থে টিকে থাকে, যখন তা স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং মানসিক আন্তরিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'যাও পাখি' উপন্যাসটি পাঠকের সামনে এভাবেই জটিল দাম্পত্য সম্পর্কের সার্থক চিত্রগুলি তুলে ধরে - যেখানে প্রেম, প্রত্যাশা, অবহেলা ও আত্মপরিচয়ের সংকট একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। উপন্যাসে চিত্রিত এইসব দাম্পত্যজীবন যেন এক একটি প্রতীক হয়ে ওঠে - এই সমাজে অসংখ্য দাম্পত্যের নিঃশব্দ টানাপোড়েনের। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এখানে কোনও পক্ষকে সম্পূর্ণ দোষী বা নির্দোষ করে দেখাননি; বরং মানুষের মানসিক গঠন, পারিবারিক কাঠামো এবং একে অপরকে বুঝতে না-পারার ব্যর্থতাকেই কেন্দ্র করে তিনি সম্পর্কের সংকট সৃষ্টি করেছেন।

এই উপন্যাস আমাদের শেখায় যে, দাম্পত্যজীবনে কেবল ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন মানসিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, এবং একে অপরকে নিঃস্বার্থভাবে বোঝার ক্ষমতা। কর্মব্যস্ততা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং মানসিক ক্লান্তি আমাদেরকে কাছের মানুষ থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়। ফলত, সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায় নিষ্ঠুর নীরবতা, আত্মিক দূরত্ব, এবং নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার আকুতি। একজন যেমন নিজের মধ্যে ক্রমাগত এক শূন্যতা অনুভব করে, তেমনই অন্যজনের মধ্যেও রয়েছে একরকম অসন্তোষ ও অসহায়তা।

তবে ঔপন্যাসিক এই দাম্পত্য সংকটের মধ্যেও আশার আলো দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন যেমন বেদনার, তেমনি সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়েও তিনি আশাবাদী। উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে সেই আশাবাদের চিত্র দিয়ে - যেখানে ব্রজগোপাল-ননীবালা পুনরায় সংসার পেতেছে, রণেন-বীণা পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে, অজিত-শীলার মধ্যকার প্রেম আবার ফিরে এসেছে।

এইভাবে 'যাও পাখি' কেবল দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের গল্প নয় - এটি এক মানবিক আখ্যান, যা আমাদেরকে নিজেদের সম্পর্কের দিকে ফিরে তাকাতে শেখায়। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সম্পর্ক যতই জটিল হোক না কেন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলে সেখানে পুনর্মিলনের সম্ভাবনাও থাকে। উপন্যাসের নামটি যেমন একটি পাখির উড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তেমনি প্রতিধ্বনিত হয় মুক্তির, খোঁজের ও ফিরে আসার আভাস। দাম্পত্যের এই টানাপোড়েন তাই একদিকে যেমন অস্থিরতা সৃষ্টি করে, তেমনি অন্যদিকে সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে বোঝার একটি সুযোগ করে দেয়। আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হল আলো-আঁধারের এক নিখুঁত সমন্বয় - যেখানে টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত রচনা করে এক অনন্য মিলনের ইতিহাস।

Reference:

1. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *যাও পাখি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৪, 'গ্রন্থাকারের নিবেদন' অংশ।

২. তদেব, কভার পেজ।
৩. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *যাও পাখি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৪, পৃ. ৫
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ৬-৭
৬. তদেব, পৃ. ৭
৭. তদেব, পৃ. ৭
৮. তদেব, পৃ. ৩৮৯
৯. তদেব, পৃ. ৬২
১০. তদেব, পৃ. ৬৩
১১. তদেব, পৃ. ৬৭
১২. তদেব, পৃ. ৭৫
১৩. তদেব, পৃ. ৬১-৬২
১৪. তদেব, পৃ. ১০৬
১৫. তদেব, পৃ. ১২৪